মেটামরফোসিসের কাফকা ও গল্পকথা

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

পুনশ্চ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম ভাগ ৯

'দ্য মেটামরফোসিসে'র কাফকা ও সামাজিক তাৎপর্য / ১১
তৃতীয় বিশ্বের কয়েকজন মহিলা-গল্পকার / ২৪
চীনের ছোটোগল্পকার মাও-তুনের মতাদর্শ ও জীবনবোধ / ৩৯
গোর্কির ইতালির রূপকথা : মানবিকতার ধ্রুপদী দলিল / ৪৪
গার্সিয়া মার্কেসের ছোটোগল্প : পঞ্চাশ ও ষাট-সত্তরের দশক / ৫৭
নীতিকথার কথান্তর ও ইভান্ ক্রিলভ / ৭৯
ছোটোগল্প সমীক্ষা : তৃতীয় বিশ্ব (লাতিন আমেরিকা) / ৮৫
ছোটোগল্প সমীক্ষা : তৃতীয় বিশ্ব (আফ্রিকা) / ৯৫
ছোটোগল্প সমীক্ষা : তৃতীয় বিশ্ব (এশিয়া) / ১১২
কাহিনিকার চার্লি চ্যাপলিন ও কিছু তথ্য / ১৪৪
চার্লস ডিকেন্স ২০০ বছর পরেও / ১৫৩

দ্বিতীয় ভাগ ১৬১

ছোটোগল্পের নান্দনিকতা / ১৬৩
ছোটোগল্প-সম্পাদনা / ১৭৪
অণুগল্পের ভূমিকা ও তাৎপর্য / ১৮২
কথা-সাহিত্যে লোক-উপাদান : একটি সীমাবদ্ধ পর্যালোচনা / ১৮৮

তৃতীয় ভাগ ২০৯

১৯৪১, শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথের চারটি ছোটোগল্প / ২১১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাহিনি-রচনা / ২২৬
জীবনানন্দের ছোটোগল্পে রাজনীতির কথা / ২৪৪
ত্রিশের দশকের ছোটোগল্পকারদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ / ২৫৪
দেশজ সংস্কৃতি : গল্পকার সুশীল জানা / ২৬১
গদ্যশিল্পী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে ভিন্নতা / ২৬৯

পরিশিষ্ট ২৮৭

চণ্ডীমঙ্গল গল্পকথা : তখনো-এখনো, এক ধারাভাষ্য / ২৮৯

॥'দ্য মেটামরফোসিসে'র কাফকা এবং সামাজিক তাৎপর্য॥

ফ্রান্ৎস কাফকার এক বান্ধবী ছিল। বান্ধবীটির নাম ফেলিস্ বাউয়ার। কাফকা অনেক নামেই তাকে চিঠি লিখতেন যেমন, ফেলিস, ফ্রাউলিন পেলিস, ফ্রাউলিন বাউয়ার, প্রিয়তমা। 'দ্য মেটামরফোসিস' ছোটোগল্পটির নির্মাণ বিষয়ে অনেক কথা ফেলিসকে জানিয়েছেন কাফকা, সূচনা পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত। লিখেছেন ঃ ভীষণ অস্বস্তি ও দৈন্যের মধ্যে যখন বিছানায় পড়েছিলাম, তখন আমার মাথায় একটা ছোট্ট গল্প দানা বাঁধে। আর সেটাই তখন আমাকে আরো অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। তার চাহিদা—তাকে এখনই লিখে ফেলি।

এটাই হচ্ছে 'মেটামরফোসিস' ছোটোগল্পটির উৎস। উৎসের সময়টা ধরা আছে চিঠির তারিখেই, প্রাগ, ১৭ নভেম্বর ১৯১২। আবার কাফকা ১৮ নভেম্বর ১৯১২-তে ফেলিসকে লেখেন, 'এখন রাত্রি দেড়টা, যে গল্পের কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম, তা কোনোক্রমে শেষ করে ফেলেছি।' আবার কাফকা ফেলিসকে 'প্রিয়তমা' সম্বোধন করে ২৩.১১.১১২ চিঠিতে লেখেন, 'এখন বেশ রাত; আমি আমার ছোটোগল্পটি পাশে সরিয়ে রেখেছি, যেটিতে গত দু'তিনটি সন্ধ্যা একেবারেই হাত দেইনি। গল্পটি বাড়তে বাড়তে বেশ বড়ো মাপের একটা গল্প হতে চলেছে। আমি তোমার সামনে বসে গল্পটি তোমাকে পড়ে শোনাব, আর সেটাই হবে সুন্দর এবং এই গল্পটি পড়তে পড়তে তোমার হাতও হয়তো আমি ভয়ে আঁকড়ে ধরতে পারি, কেননা গল্পটিতে সামান্য একটু ভয় রয়েছে। গল্পটির নাম দিয়েছি 'দ্য মেটামরফোসিস'। আমাদের মনে হচ্ছে, তিনি আগে গল্পের খসড়া করে রাখেন। কাফকা গল্পটি কোনোক্রমে শেষ করেছেন, পরিপূর্ণতা ছাড়াই। আবার লিখতে গিয়ে লক্ষ করেন গল্পটি বড়ো মাপের হয়ে যাচ্ছে। গভীর রাতে লিখতে ভালোবাসেন, চুপচাপ সময়ের সময়টাতে। এর পরের চিঠিগুলিতে ব্যক্তিগত ভাব-ভালোবাসার কথা লেখার পর ফিরে আসেন 'মেটামরফোসিস' প্রসঙ্গে, লেখেন, 'আমার গল্পের নায়কেরও (গ্রেগর) আজকের সারাদিনটি খুব খারাপ কেটেছে, তা সত্ত্বেও বলি এটা তার (গ্রেগর) দুর্ভাগ্যের শেষ ধাপ এবং ভবিষ্যতে আর ওকে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না।' কারণ গ্রেগর, 'দ্য মেটামরফোসিস' ছোটোগল্পের নায়ক মারা যাবে। কাফকার মতে ছোটোগল্পটি 'একটি বীভৎস গল্প। সামগ্রিকভাবে লেখাটিতে আমি খুব একটা অতৃপ্ত নই।' তারপর তিনি 'দ্য মেটামরফোসিস' ছোটোগল্পটি প্রসঙ্গে লেখেন ৬ ডিসেম্বর ১৯১২-র চিঠিতে,

লেখেন প্রিয়তমা ফেলিস, 'কাঁদো, প্রিয়তমা কাঁদো, এখন কান্নার সময়। মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার গল্পের নায়ক (গ্রেগর)। মারা গেছে।...সকলকে শুধরে দিয়ে অবশেষে শান্তির মৃত্যু পেয়েছে সে (গ্রেগর)'। কিন্তু তখনো গল্পটি পরিপূর্ণতা পায়নি, যখন কাফকার ৭ ডিসেম্বর ১৯১২-র ফেলিসকে লেখা চিঠিটা পড়ি। ফেলিসকে তিনি লিখছেন, 'এবার শোনো আমার ছোটোগল্পটি শেষ হয়েছে। কিন্তু আমাকে আদৌ সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সত্যি সত্যিই এটিকে যে আরো একটু ভালো করা যেত এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'মেটামরফোসিস' ছোটোগল্পটি সম্পর্কে এটাই শেষ কথা ফ্রান্ৎস কাফকার। এই ছোটোগল্পটি লিখতে কাফকার কুড়িদিন লেগেছে। তিনি লেখা শুরু করেছেন ১৭ নভেম্বর ১৯১২ সালে, শেষ করেছেন ৬ ডিসেম্বর ১৯১২ সালে। তখন তাঁর বয়স ত্রিশও হয়নি (জ. 1883)।

ফ্রান্ৎস কাফকার চিঠি (ফেলিসকে লেখা) থেকে আমরা জানতে পারি, 'আমি কোনো কিছুই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো তর্‌তর্‌ করে লিখে উঠতে পারি না।' এরপরেও চিঠি পড়ে জানতে পারি, ঠিকঠাক লিখতে না পারার মানসিক যন্ত্রণার কথা যা তিনি জানিয়েছেন তাঁর প্রেমিকা বাউয়ার ফেলিসকে। তিনি জানিয়েছেন তাঁর উদ্বেগের কথা, তাঁর অসহায়তার কথা। কাফকা বার বার লিখেছেন তাঁর অস্থিরতা ও চঞ্চলতার কথা, মানসিক শান্তি ও স্থিরতার কথা, তুমুল দৈন্যের কথা, অশুভ আত্মার কথা, মানসিক চাপের কথা, অস্থির প্রকৃতির কথা।

এইসময় তিনি প্রথমে ঢুকেছিলেন একটি প্রাইভেট ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে। তারপর তিনি ঢুকেছিলেন ওয়ার্কার্স একসিডেন্ট ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট-এ, ১৯১২ নভেম্বর মাসের মধ্যেই; 'দ্য মেটামরফোসিস' ছোটোগল্পটি লেখার সময়। এই ছোটোগল্পটি লেখার সময় কাফকার বাবা-মা কাফকাকে চাপ দিত পার্টটাইম কাজের জন্য অ্যাস্‌বেস্টস ফ্যাক্টরিতে। এই অ্যাসবেস্টস ফাক্টরিটা ছিল কাফকার বোন এলির স্বামীর। কাজের এই বাড়তি চাপ নিতে পারবেন না বলেই তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কাফকার বন্ধু ম্যাক্স ব্রড ঐ সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পেরেছেন। এরকম আর্থিক চাপ থেকে, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা থেকে, অসহায়তা থেকে জন্ম নিয়েছে বিশ্ববিখ্যাত ছোটোগল্প 'মেটামরফোসিস' এবং গ্রেগর, ৬ ডিসেম্বর ১৯১২ সালে শতবর্ষ আগে (+8)। একশো বছর পরে এখনও পাঠক স্রোতে ভাসমান ফ্রান্ৎস কাফকার এই ছোটোগল্পটি।

ফ্রান্ৎস কাফকা একটি চিঠিতে (৭ ডিসেম্বর ১৯১২) ফেলিসকে এক মূল্যবান বক্তব্য জানিয়েছেন তাঁর 'মেটামরফোসিস' ছোটোগল্পটি প্রসঙ্গে, 'বাস্তবতা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থাকে যুক্তি হিসেবে এর পেছনে খাড়া করা যাবে না।' এই বক্তব্যের (বাস্তবতা ছাড়া) সূত্র ধরেই এই আলোচনা এগিয়েছে।

● মেটামরফোসিসের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

ফ্রানৎস কাফকার (FRANZ KAFKA) বিখ্যাত ছোটোগল্প 'দ্য মেটামরফোসিস'। মেটামরফোসিস (metamorphosis), এই ইংরেজি বিশেষ্য পদটি বাংলায় অনেকভাবে অনুবাদ করা যায়। যথা, রূপান্তরের কাহিনি, আকৃতির পরিবর্তন, রূপান্তর বা পোকা ইত্যাদি।

কাফকার 'দ্য মেটামরফোসিস' গল্পটি জার্মান দেশের কোনো এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারকে নিয়ে লেখা। কাফকা-পরিবারের কাহিনিও অনেকাংশে 'দ্য মেটামরফোসিস' গল্পের মতোই ছিল। বলা যেতে পারে কাফকার ব্যক্তিগত জীবনের গভীর রেখাচিত্র। কাফকার বয়স তখন ত্রিশ। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্পটি লেখেন। বাবা-মা এবং ভাই-বোন যথাক্রমে গ্রেগর, গ্রীট এই নিয়ে 'মেটামরফোসিস্' গল্পের পরিবার। তিন ঘরের একটি দামি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে শহরের অভিজাত অঞ্চল শারলোট্রেনস্ট্রাসে বাস করে। সময়টা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের কাল, ১৯১৩।

এই পরিবারে আছে ঠিকা ঝি এবং রাঁধুনি। উৎসবে অনুষ্ঠানে পরে যাবার মতো মা-বোনের যথেষ্ট অলংকার আছে। কার্পেট বিছানো ঘর। দামি দামী ফার্নিচার, সুসজ্জিত। এসবই সম্ভব হয়েছে গ্রেগর সামসার মোটা মাইনের চাকরির জন্য। সে এক ব্যবসায়িক ফার্মে সেলস্‌ম্যানের চাকরি করে। ঐ ফার্মে চার বছর চাকরি করেই গ্রেগর মোটা অঙ্কের সিঁড়ির উঁচু ধাপে উঠে যায়। আগে ঐ ফার্মেই কেরানির কাজ করত। ভোর সাতটায় চাকরি করতে বের হয় এবং সন্ধ্যায় মদ্যপান করে ঘরে ফেরে গ্রেগর। গ্রেগরের বাবার কাজ নেই। তিনি ঘরেই থাকেন। এক সময় তিনি একটা ব্যবসা করতেন। সেই ব্যবসা ফেল করেছে। সে সময় তিনি কিছু মোটা টাকা সরিয়ে রেখেছিলেন। গ্রেগর সেটা জানত না। আসলে বাবা জানতে দেননি। এতকাল গ্রেগরের ধারণা ছিল যে ব্যবসা ফেল হওয়ার দরুন বাবা এক কানাকড়িও রক্ষা করতে পারেননি।

সামসা পরিবারে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আভিজাত্য এনে দিয়েছে গ্রেগর। সেজন্য এই পরিবারের ভয় যদি গ্রেগরের চাকরি চলে যায় বা গ্রেগর যদি চাকরি ছেড়ে দেয় বা গ্রেগরের যদি কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে পুনরায় ফিরে আসবে ধ্বস্ত জীবন। মুহূর্তেই উবে যাবে এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য, এই আভিজাত্য। আর ঐ ব্যবসায়িক ফার্মের মালিকের মর্জির উপর নির্ভর করছে গ্রেগর। এসব ভেবেই গ্রেগরকে বাবা এবং বোন গ্রীট তোয়াজ করে। চাকরি থেকে সন্ধ্যায় গ্রেগর ফিরে এলে বাবা পুত্রের ঘরে গিয়ে দু'একটা কথার কুশলবার্তা জেনে নেয়। বোন মাঝে মধ্যে বেহালা বাজিয়ে ভাইকে শোনায়। একমাত্র চির রুগন্ মা এর ব্যতিক্রম। যে কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে কাজ করার জন্যই যেন মাতৃত্বের আবির্ভাব এই সংসারে।

এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মুদ্রাস্ফীতিতে স্ফীতকায় ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থাই তাদের সম্পর্কিত অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। এই সম্পর্ক এবং অস্তিত্বটা সরিয়ে দিলে মা-বাবা এবং ভাইবোনের অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় সেটাই কাফকা এই গল্পে সুন্দর এবং নিখুঁত বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংকটাপন্ন অবস্থার পরিণতি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

ধনতান্ত্রিক সমাজে সংকটাপন্ন আর্থিক সীমার মধ্যে ব্যক্তি মালিকানার সাথে গ্রেগরের আর্থিক সম্পর্ক এবং অস্তিত্ব, গ্রেগরের সাথে পরিবারের সম্পর্ক এবং অস্তিত্ব বোঝাতে সাহায্য করেছেন কাফকা এই গল্পে।

ফার্মের মালিক এবং ম্যানেজারের কাছে গ্রেগর মানুষ নয়। গ্রেগর সেখানে ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধির জন্য এক মূল্যবান যন্ত্র বিশেষ। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানবিকতা বাজারি পণ্য ছাড়া কিছু নয়। এ বোধ কাফকা পাঠকের মধ্যে জাগিয়ে দেন। যার জন্য গ্রেগরের অসুখকে বা একদিনের স্বাধীন আলস্যকে কোনোপ্রকার গুরুত্ব না দিয়ে ফার্মের ম্যানেজার বলতে পারেন, 'যাহোক আমরা ব্যবসা বুঝি। আমরা কাজ চাই। তোমাকে অফিসে আসতেই হবে।'

গ্রেগরের সংকট স্বাধীন চলাফেরা এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার সাথে পরাধীন আর্থিকতা এবং পরিবারের ভরণপোষণ। একদিকে গ্রীটের বেহালার সুরের জগৎ, অপরদিকে বাঁচার এবং বাঁচবার তীব্র যন্ত্রণা। মাঝখানে গ্রেগরের স্বাধীন সত্তা। এখানেই লেনিনের কথা মনে আসে, 'বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মহোদয়রা, আমরা বলতে বাধ্য যে আপনাদের পরম স্বাধীনতা কথাটা একেবারেই ভণ্ডামি। যে সমাজ অর্থ-আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে মেহনতি জনগণ দারিদ্র্যে ভোগে, আর পরজীবী হয়ে দিন কাটায় মুষ্টিমেয় ধনী, সেখানে বাস্তব ও সত্যকারের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। যে সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থ-আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে না।' কাফকা লেনিনের বক্তব্যকেই উন্মোচিত করেছেন 'মেটামরফোসিস' ছোটোগল্পে। কাফকার নায়ক গ্রেগর ভাবছে, 'যে করেই হোক ম্যানেজার সাহেবকে ধরতে হবে, মন জয় করতে হবে।' মালিকের মর্জির ওপরেই এখন গ্রেগর এবং তার পরিবারের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে চাকরি-জীবন কত যে দুর্বিসহ, পারিবারিক জীবন কত যে অন্তরবিযুক্ত এবং জীবনের রসকে কীভাবে নিংড়ে আখের ছিবড়েতে পরিণত করে দেয় তা জানতে-বুঝতে পারি গ্রেগরের অনুভবের ভিতর দিয়ে। গ্রেগর ভাবে প্রতিদিন একইভাবে সাত সকালে বিছানা থেকে ওঠা-ব্যাপারটার মতো বাজে ব্যাপার জীবনে আর কিছুই হতে পারে না। নিজের মধ্যে অবস্থান করে গ্রেগর নীরব প্রতিবাদ জানায় ঃ 'বাবা-মার ভরণপোষণের ঝামেলা না থাকলে কিছুতেই আমি এ চাকরি করতাম না। সোজা মালিকের কাছে গিয়ে বলতাম, দিনরাত ঘুরে ঘুরে কাজ করা আমার পোষাবে

না।' এরপরও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে গ্রেগরকে এই পরিবেশের কাছে নতজানু হতে হয়। প্রতিবাদী মানসিকতা যখন প্রতিবাদের কোনো পথ খুঁজে পায় না তখনই সে প্রতীকী কীটে বা পোকায় পরিণত হয়ে যায়। এই মহৎ ভাবনাটাই কাফকাকে সাহিত্যের জগতে মহান এবং ছোটোগল্পকার হিসেবে শক্তিশালী করে রেখেছে। 'দ্য মেটামরফোসিস' গল্পের মুল চরিত্র গ্রেগর সামসাও কীটে পরিণত হয়ে যায়। গল্পের শুরুও হয় এভাবে, 'বিশ্রী স্বপ্ন দেখার পর একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই বিছানায় শুয়ে গ্রেগর সামসা বুঝতে পারল যে সে একটা ভয়াবহ পোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।' অসহায় মানসিকতা, বিচ্ছিন্নতা-বোধ, সারেন্ডার মনোভাব এবং বাঁচার ভয় ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মালিকাধীন এবং মালিকানুগত কর্মচারীদেরকে পোকায় পরিণত করে ফেলছে। এর জন্যই মার্কস-লেনিন দাবি করেন, বিপ্লবের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে শ্রমিক কৃষকের ঐক্য। কারণ এঁরাই সরাসরি উৎপাদন ব্যবস্থায় সাথে যুক্ত। গ্রেগর সামসার মতো কর্মচারীরা নয়। অফিসের কর্মচারীরা প্রতিবাদের পথ হিসেবে যদি কোনোদিন আন্দোলন বা মিছিলও করে তা একদিন হয়ে যাবে যান্ত্রিক। শেষপর্যন্ত মালিক বা শোষকগোষ্ঠী ওতে ভয় পায় না।

এই গল্পে দেখতে পাই গ্রেগরের রাগ আছে, ক্রোধ আছে, ক্ষোভ আছে, কিন্তু বাঁচার প্রশ্নে প্রতিবাদ করতে পারে না, ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে না। গ্রেগর দুর্বল, গ্রেগর অসহায়, গ্রেগর বিচ্ছিন্ন। সে যুগ-যন্ত্রণাক্রান্ত।

গ্রেগরের পোকায় রূপান্তরিত হওয়ার আরও একটি দিক আছে। সেটা হচ্ছে গ্রেগরের জীবনের অস্তিত্ব এবং সমাজ ও পরিবারের সাথে ব্যক্তি জীবনের সম্পর্ক। গ্রেগর যখন মোটা বেতনের চাকরি করত তখন পরিবারের সাথে গ্রেগরের সম্পর্ক এবং যখন চাকির না করে কীটে রূপান্তরিত হয়ে পরিবারের বোঝা হয়ে দিনরাত কাটাত পরিবারের সাথে তখনকার (এখানে বুর্জোয়া অর্থনীতি মানবিক সম্পর্কগুলোকেও রূপান্তরিত করে তুলছে) সম্পর্ক কি অভিন্ন? না অভিন্ন নয়। গ্রেগরের জীবনকে সময়ের দুভাগে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারা যায় যে অস্তিত্ব ও সম্পর্কগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব অনেকটা। জীবনের বনিয়াদ অর্থ যোগাড় দিতে না পারলে পরিবারের ভালোবাসা হয়ে ওঠে অস্বস্তিকর, নির্দয়যন্ত্র বিশেষ। গ্রেগর বুঝে মরল যে চারদিকে দস্যুর মতো নিষ্ঠুর অন্ধকার। সে এ বাড়িতে এখন অবাঞ্ছিত।

● মেটামরফোসিস ও বিচ্ছিন্নতা

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগের ও শ্রম-বিভাগের ফলে মানুষ নিজের শ্রম থেকে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, পরিবার থেকে